ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 847- 852
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.297

গণেশ দের ‘অতি সাধারণ এক কাহিনি’: একটি বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন

বাপ্পন দেবনাথ, *সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, আর্য্য বিদ্যাপীঠ মহাবিদ্যালয় (স্বায়ত্বশাসিত), অসম, ভারত*

Received: 25.03.2026; Accepted: 27.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Among the few storywriters who enriched the Bengali Literature of the North-East in the 20th century, Ganesh Dey is a renowned writer. Where the Bengali literature of the North-East has a label called 'Deshbhag' in the mind of the reader; Ganesh Dey has given the reader a taste of a different story. However, Ganesh Dey's works have been discussed a little less in Bengali Literature. Although there is currently a lot of discussion among researchers or readers. Ganesh Dey was born on 8th May, 1941 in Lakshmipur village of Silchar city and died on 18th September, 2013. His literary life is thirty years. However, he limited his literary life only to writing 'Column'. Ganesh Dey has written six novels, forty-eight stories, more than a thousand Columns and several romantic Compositions and a few Poems.

Our proposed topic of discussion is “Ganesh Dey’s ‘Ati Sadharan Ek Kahini’: An Analytical Study”. The story begins with a conversation between the author and a rickshaw puller. And in their conversation, another aspect of the masked nature of 20th century urban life emerges. Our main discussion will attempt to highlight those aspects.

Keywords: Uttarpurba, Deshbhag, Romantic, Column, Rickshaw Puller, Urban life

> “চোখের সামনে কোন ঘটনা ঘটতে দেখলে আমার মনে হয় এটা তো অন্যরকম পরিণতি পেতে পারত যা আমাদের কাম্য প্রার্থিত তখনই গল্প লেখার প্রেরণা পাই ... আমি গল্পের জন্য গল্প লিখি না চাবুক আর তুলিকে এক করে আমি গল্প লিখে জীবনের জন্য।”[১]

কথাগুলো গণেশ দে কেন গল্প লিখি?’ বলে একটি রচনায় তিনি একজন পাঠকের প্রশ্নের উত্তরে লিখেছিলেন।

বাংলা সাহিত্য তথা উত্তর-পূর্বের বাংলা সাহিত্যের একজন অন্যতম সাহিত্যিক গণেশ দে। তবে অসম তথা বাংলা সাহিত্যে গণেশ দে-র রচনা একটু কম আলোচিত হয়েছে।উত্তর পূর্বাঞ্চলের বাংলা সাহিত্য মানে পাঠকের মনে যেখানে ‘দেশভাগ’ নামক একটি তকমা গেঁথে গেছে; সেখানে দাঁড়িয়ে গণেশ দে এক অন্যরকম গল্প উপন্যাসের স্বাদ দিয়েছেন পাঠককে।

গণেশ দে-র জন্ম ১৯৪১ সালের ৮ই মে শিলচর শহরের লক্ষ্মীপুর গ্রামে এবং মৃত্যু ২০১৩ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর। তাঁর সাহিত্যিক জীবন ত্রিশ বছরের। তবে এরপরও তিনি তাঁর সাহিত্যিক জীবন শুধুমাত্র 'কলাম' লেখার মধ্যেই সীমিত রেখেছেন। এই সীমিত সময়ে গণেশ দে ছয়টি উপন্যাস, আটচল্লিশটি গল্প, হাজারেরও বেশি কলাম এবং বেশ কয়েকটি রম্যরচনা ও কবিতা রচনা করেছেন। বাংলা সাহিত্যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাহিত্যের একটি বিশেষ স্থান আছে। উত্তর-পূর্বের বিশেষ করে অসমের কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিকরা উনিশ শতক থেকেই সাহিত্য রচনা করে আসছেন। একসময় এই অঞ্চলের সাহিত্যিকদের লেখা ছিল সাময়িকপত্র নির্ভর, কিন্তু প্রকাশনার অভাবে অনেক রচনা শুধুমাত্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলেই সীমাবদ্ধ থেকে গেছে। 'নির্বাচিত বাংলা ছোটগল্প উত্তর-পূর্ব' গ্রন্থের সম্পাদকীয় অংশে জানানো হয়েছে যে,

> "বাংলা সাহিত্যের কেন্দ্রের স্পটলাইটের আলো অবশ্য এত দূর পরিধিতে কখনই পৌঁছায় না। এ নিয়ে আক্ষেপের কিছু নেই। ইনার ইন্ডিয়ান বেঙ্গলি ডায়াসপোরার কোথায়ই-বা পৌঁছায় সেই আলো? মনে হয়, আলোর এই বিপ্রতীপ অবস্থান উত্তর-পূর্বের কথাকারদের মনে তেমন কোনো সংকট সৃষ্টি করতে পারেনি। বরং তাঁদের হয়তো স্বস্তিই দিয়েছে এজন্য যে তাঁদের সামনে ইঁদুর দৌড়ের কোনো অনিবার্য ট্র্যাক অপেক্ষা করে নেই। তাঁদের সামনে ঝুলে নেই ঘড়ি ধরে সাহিত্য উৎপাদনের পরোয়ানা। মূলত ক্ষুদ্র পত্রপত্রিকা নির্ভর, অপেশাদার এ অঞ্চলের কথাকারদের যাবতীয় সৃজনকর্মই অন্তরতাগিদজাত বললে ভুল বলা হবে না।"[২]

কিন্তু বর্তমান সময়ে প্রকাশনার সমস্যাগুলো কিছুটা কমতে দেখা যায়। এবং তাঁর কৃতিত্ব দিতে হয় এই অঞ্চলের প্রকাশকদের। বাংলা সাহিত্যের বৃহৎ পরিসরে গণেশ দের নাম তুলনামূলকভাবে কম আলোচিত হলেও বিশ শতকের শেষের দিকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের তিনি বেশ জনপ্রিয় একজন লেখক ছিলেন। বাংলা সাহিত্যে তিনি প্রথম কবি হিসেবেই আত্মপ্রকাশ করলেও পরবর্তীকালে তিনি উপন্যাস, কলাম, রম্যরচনাকার হিসেবেই বেশ পরিচিত ছিলেন।আমরা জানি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাহিত্যের একটি বড় বৈশিষ্ট্য 'দেশভাগের সাহিত্য' বা আমরা বলতে পারি দেশভাগকেন্দ্রিক রচনার জন্যই উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিশেষ করে অসমের বাংলা সাহিত্য আজ সারা দেশে পরিচিত। কিন্তু গণেশ দে-র সমগ্র সাহিত্যের দু-একটি রচনা বাদ দিলে প্রায় সব রচনাতেই আমরা উক্ত প্রচলিত ধারার পরিবর্তে সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে এক জীবনবোধের কথা বা মানুষের মনের ভাবনার কথা দেখতে পাই।

এখানে উল্লেখ্য ভারতবর্ষ বা অসমের রাজনীতিতে যে পালাবদল বা দেশভাগের মতো বড় ঘটনা ঘটেছে, তার ছাপ গণেশ দের উপন্যাস বা গল্পে তেমন উঠে আসেনি। আর হয়তো এই জন্যই বর্তমান সময়ের অনেক পাঠক ও গবেষকের কাছে গণেশ দের নামটি অনালোচিত হয়ে আছে। আবার অন্যভাবেও বলা যায় যে 'দেশভাগ' বিষয়টি যখন অসমের সাহিত্যিকদের মূল বিষয় তখন সেই সময়ে এক অন্য স্বাদের রচনা লিখে পাঠকদের মন জয় করেছিলেন গণেশ দে।

আমাদের প্রস্তাবিত আলোচনার বিষয় গণেশ দের 'অতি সাধারণ এক কাহিনি': একটি বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন'। 'অতি সাধারণ এক কাহিনি' গল্পে লেখক গল্পকথক।গল্পে লেখক ও এক রিকশাওয়ালার কথোপকথনের মধ্য দিয়ে সমাজের নানা রূপ আমাদের সামনে উঠে এসেছে। গল্পে যেমন উঠে এসেছে সরল মনের মানুষদের কথা, তেমনি উঠে এসেছে মদ্যপান সমাজের কথা। আবার কীভাবে উচ্চশ্রেণির মানুষের অর্থবলের কাছে নিরুপায় রিকশাওয়ালা নিজের প্রেমকে সামনে দেখেও কিছু বলতে পারে না– সেই ছবিও ধরা পড়ে।

গল্পটি লেখকের সাহিত্য-জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ের হওয়ায় গল্পের কাঠামোয় কিছুটা দুর্বলতা থাকলে লেখকের অভিজ্ঞতায় তা একটি অসাধারন গল্পের রূপ নেয়। গল্পটি যদি আমরা আলোচনা করি দেখেতে পাই, কালাচাঁদ যার ভালো নাম চন্দ্রশেখর, যে একজন রিক্সাওয়ালা এবং গল্পকথক যার ভালো নাম মনোময়, তিনি অবশ্য কোনো অফিসের বড়বাবু। তবে তারা একসঙ্গে মদ খায়। একদিন রাতে তারা খুব মদ পান করে এবং সেদিনই কালাচাঁদ তার অন্তরের সমস্ত ব্যাথা মনোময়ের কাছে উগড়ে দেয়। চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী ওরফে কালাচাঁদ আসলে মূর্খ অশিক্ষিত রিক্সাওয়ালা নয়, সে হল ক্লাস নাইন পাস এক দরিদ্র পরিবারের সন্তান যে উঁচু তালার মানুষদের চক্রান্তের শিকার হয়ে সর্বশ্রান্ত হয়ে শহরে আসে জীবিকার তাগিদে, সেই সঙ্গে অনেকটা স্বপ্ন নিয়ে তার ভালোবাসার মানুষের সাথে সংসার করার স্বপ্ন দেখে। কিন্তু তার সেই স্বপ্ন সমাজের কলুষিতায় বাস্তবে রূপ নিতে পারেনি, কেননা সে চন্দ্রশেখর থেকে হয়ে ওঠে রিক্সাওয়ালা কালাচাঁদ। রিক্সাওয়ালা কালাচাঁদ হয়ে ওঠার পেছনে কাকতালীয়ভাবে মনোময়কেই যেন কিছুটা দায়ী করা হয়, কেননা চন্দ্রশেখর শহরে এসে বিভিন্ন অফিসে দরখাস্ত দেয়, সেই সঙ্গে অফিসের বড়বাবু মনোময়ের কাছেও পিয়নের চাকরির জন্য দরখাস্ত দেয়; কিন্তু তা মঞ্জুর হয় না।

আমরা জানি জীবিকা মানুষের জীবনকে টিকিয়ে বা বাঁচিয়ে রাখে। তাই সব জীবিকাই নিজস্ব গুনে বিদ্যমান কোন জীবিকাই ছোট নয়। তবুও যোগ্যতা সম্বন্ধে জীবিকা অর্জন সবারই প্রাপ্য। চন্দ্রশেখর যেহেতু নাইন পাস করেছিল, তাই সে পিওনের চাকরির দরখাস্ত করেছিল। আমাদের সমাজ ব্যবস্থা একটা মানুষের জীবিকার উপর ভিত্তি করে মূলত তার ব্যক্তিত্ব বিচার করে। লেখকের ভাসায়- "গতকাল পর্যন্ত পেলে রিকশা ছেড়ে ভদ্রজীবনে প্রবেশ করতাম।"[৩] অর্থাৎ যদি সে রিক্সাওয়ালা না হয়ে পিওন হত, তবে ভদ্রসমাজে স্থান পেত। আজ রিকশাচালক বলে 'So Called' ভদ্র সমাজে জায়গা পায়নি। এখানে গল্পকার ভদ্র সমাজের পথিক হিসেবে মনোময় চরিত্রটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন। গল্পকালের ভাষায়- "জীবনসন্ধানী তাই সর্বস্তরের লোকের আড্ডাতেই ওর যাওয়া আসা আছে।এই রিক্সাওয়ালাদের সাথেও ওর বেশ মেলামেশা ওটা অবশ্য গভীর রাতে।"[৪] অর্থাৎ দিনের আলোতে মিশলে সমাজের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে, তাই সে গভীর রাতে মেলামেশা করে সেই সঙ্গে রাতে নিজের বড় চাকরির পরিচয়টাও তাকে আড়াল রাখতে হয়। তাইতো আজও মদ পান করা ভদ্র সমাজে 'ফ্যাশন' আর সমাজের নিম্নস্তরে সেটাই হয়ে ওঠে 'মাতলামি'। উঁচু তালা লোকদের কাছে একটি পিয়নের চাকরি হয়তো সামান্য, কিন্তু নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের কাছে এই সামান্য চাকরি আকাশের চাঁদ পাওয়ার সমান। তাদের কাছে শুধু এটা চাকরি নয়, হাজারও রঙিন স্বপ্ন। সেই স্বপ্নটা একদিন চন্দ্রশেখর দেখেছিল–

> "গতকাল পর্যন্ত পেলে রিকশা ছেড়ে ভদ্র জীবনে প্রবেশ করতাম। গোঁফ-দাড়ি ফেলে কালাচাঁদ আবার চন্দ্রশেখর হতাম। চামিলিকে আনিয়ে নিতাম। একখানা সংসার ছোট্ট, বুঝলে লেখকবাবু ছোট্ট সংসার করতাম।"[৫]

চামেলি কালাচাঁদের মনের মানুষ। যাকে সে কথা দিয়ে এসেছিল, চাকরি পেয়ে শহরে নিয়ে এসে দুজনে বিয়ে করবে আর ভালোবাসা দিয়ে ছোট্ট সংসার করবে। চামিলিও কেঁদে কেঁদে বলেছিল— "সারারাত না-ঘুমানো ফোলা চোখ জলে ভরে বলেছিল তাড়াতাড়ি তাকে নিয়ে আসতে।"[৬] কিন্তু এই অপেক্ষারত মেয়েটি অপেক্ষায় করে গেল, তার ভালোবাসার মানুষটিকে আর ফিরে পেল না।

এখানে গল্পকার অতি-নিম্নবিত্ত পরিবারের ব্যর্থ প্রেমের কাহিনিটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন। দুটি সহজ সরল মানুষের নিষ্পাপ প্রেম শুধুমাত্র চাকরি না পাওয়ায় তরুণ শূন্যে হারিয়ে গেল। যখন কালাচাঁদ সবকিছু হারিয়ে একা হয়ে পড়েছিল; ঠিক তখনই চামেলির জন্যই শহরে এসেছিল, টাকা রোজগার করে তাকে বিয়ে করবে

বলে। তাই তার বাঁচার একমাত্র উৎস চামেলিকে যখন সে ফিরে পেল না, তার বাঁচার ইচ্ছেটাই চলে গেল। বছরের পর বছর কত মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহরে আসে জীবিকা অর্জনের আশায়, না জানি কত স্বপ্ন ভেঙে যায় এভাবে সকলের অগোচরে। দূর থেকে তো সমুদ্রে কেউ কত সুন্দর মনে হয়। কিন্তু জলে নামলে বোঝা যায় সমুদ্রের ঢেউ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা কতটা কষ্টকর। শহরটা ও ঠিক এই সমুদ্রের মতো, এখানেও গ্রামের সহজ সরল মানুষদের টিকে থাকা ঠিক ঢেউয়ের মতোই কষ্টকর। শহরের সভ্য সমাজে টিকে থাকাটাই বড় 'চ্যালেঞ্জ।'

চন্দ্রশেখর হাত ধরে চামেলিকে শহরে আসতে না পারলেও, সে আসে কোন এক ধনী বাবুর হাত ধরে। ঘটনাচক্রে কালাচাঁদের রিকশাতেই চামিলিকে অন্য পুরুষের সাথে ঘনিষ্ট হতে দেখেছিল, তখন কালাচাঁদ তা সহ্য করতে পারছিল না, আর তাই তার জমানো সব টাকা দিয়ে বিলাতি মদ খেয়ে মাতলামি করেছিল। এবং নিজের দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণা সব মনোময়কে বলতে গিয়েই মনোময় বুঝতে পারে চামিলের সঙ্গে সেই অন্য পুরুষটি আর কেউ নয়, স্বয়ং সে। লেখকের ভাষায়- "...কী যেন বলেছিল মেয়েটি ভীরু কাঁপা কাঁপা স্বরে... চামিলিই তো!"[৭] চামেলিকে আসলে শহরে 'আমদানি' করা হয়েছিল অর্থাৎ মেয়েটিকে বিক্রি করে দেওয়া হয়। আর কাকতালীয়ভাবে ট্যাকসো অফিসের বড়বাবু মনোময় চড়া দামে মেয়েটিকে কিনে নিয়েছিল। "চড়া দামে মাসি ওর জন্য মনোময়কেই মাত্র ঠিক করেছে।"[৮] এখানে গল্পকার সমাজের এক করুণ নগ্ন রূপকে তুলে ধরেছেন। যেই ভদ্র সমাজ নারীদের মা দুর্গা, দেবী সরস্বতী রূপে পূজা করে, সেই সমাজেরই এক শ্রেণীর মানুষ মেয়েদের অন্য রূপে বিক্রি করে দিল। তৎকালীন পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর অবস্থান বোঝাতেই লেখক মেয়েটিকে 'আমদানি' শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

স্বাভাবিক ভাবে যখন মনোময় বুঝতে পারে যে, এই মেয়েটি আসলে কালাচাঁদের চামেলি আর তার অফিসেই পিয়নের দরখাস্তটি রিজেক্ট করায় আজ চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী কালাচাঁদে পরিবর্তিত হয়েছে। মনোময় ভীষণভাবে অনুতপ্ত হয় এবং কালাচাঁদকে বলে, "...আচ্ছা তুই যদি চাকরিটা পাস, তবে তুই কি করবি?"[৯] উত্তরে কালাচাঁদ জানায় চামেলির জন্যই তার এই লড়াই; আর সেই যদি অন্য পুরুষের হয়ে যায়, তাহলে তার আর চাকরি দিয়ে ভদ্র সমাজে জায়গা করার কোন ইচ্ছা নেই। এ যেন এক ব্যর্থ প্রেমের কাহিনি যা টাকার কাছে হেরে যায়। যদিও তাদের চাহিদা ছিল খুবই সামান্য, তবুও নিষ্পাপ ভালোবাসা ধন-সম্পত্তির কাছে হার মানল।

অনুতপ্ত মনোময় পরিশেষে সিদ্ধান্ত নিল যে চন্দ্রশেখর চক্রবর্তীর 'রিজেক্ট' দরখাস্তটি বের করে তার একটা 'অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার' দেবে আর তার চামেলিকেও ফিরিয়ে দেবে। কিন্তু এখন প্রশ্ন হল চামেলিকে ফিরে পেলেও এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজের একজন হয়ে চন্দ্রশেখর কি মেয়েটির সতীত্বকে দূরে ঠেলে তার অতিকাঙ্ক্ষিত ভালোবাসার নারীকে ঠিক আগের মতোই আঁকড়ে ধরে সারা জীবন বাঁচতে চাইবে? ...এই প্রশ্নের উত্তর পাঠকদের উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে দিয়ে গল্পকার তাই নিয়তিকেই বেছে নেন। আর এই নিয়তের অভিশাপে কালাচাঁদের আচমকা গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হয়।

এদিকে গ্রামের সেই সহজ-সরল মেয়েটির রঙিন স্বপ্নকে বাস্তববায়িত করার উদ্দেশ্যে মনোময় চামিলিকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। "...তারিখটা ঠিক করে ফেলি?"[১০] আমরা অনুমান করতেই পারি যে গল্পকার গণেশ দে নারীদের যথেষ্ট সম্মান করতেন আর তাই চামেলির মতো 'আমদানি করা' মেয়েটিকেও তিনি সম্মানের আসনে বসিয়েছেন। কেননা তিনি বুঝেছিলেন বিনা স্বার্থে মেয়েটি এই নগ্ন কলুষিত সমাজের বেড়াজালে প্রবেশ করতে বাধ্য হয়েছিল। হয়তো উপযুক্ত সমাজ কাঠামো পেলে কোনদিনই কোনো মেয়ে পণ্য

হিসেবে ব্যবহৃত হতো না। এই গল্পে লেখক তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার সব নীতিকেই কুঠারাঘাত করেছেন। আর এখানেই গল্পকার গণেশ দে একটি 'অতি সাধারণ একটি গল্প'-কেও তিনি অসাধারণ করে তুলেছেন।

গণেশ দে-র অনেক গল্পেই উঠে এসেছে বিশ শতকের শেষের দিকের সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক জীবন। কোন কোন গল্পে উঠে এসেছে লেখকের নিজস্ব জীবনের অভিজ্ঞতার কথা। গণেশ দের সমসাময়িক লেখকরা যেসময় দেশভাগ, দাঙ্গা, নাগরিকত্ব প্রমাণ ইত্যাদি বিষয়কে রচনার কেন্দ্র করে গল্প উপন্যাস লিখেছিলেন, তখন গণেশ দে ছিলেন সেসকল লেখকদের থেকে ছিলেন স্বতন্ত্র। হয়তো তাঁর খুব কম লেখাতেই দেশভাগের কথা উঠে এসেছে কিন্তু তাঁর লেখার বৈশিষ্ট্য ছিল পাঠককে রসবোধ দেওয়া, আর সেটা তাঁর রচনা পাঠ করলেই বোঝা যায়। এখানে আমরা এটাও বলতে পারি যে, লেখকের সমকালীন সময়ে প্রকাশনার কাজ যদি আজকের মতো হত তাহলে অন্যান্য লেখকদের মতো তিনিও আজ বহু চর্চিত একজন লেখক উয়ে উঠতেন। তবে এও ঠিক বর্তমান সময়ে তাঁর সাহিত্যিক জীবনের সমস্ত কিছু প্রকাশ করার তাগিদা অনেক প্রকাশনা দেখাচ্ছে।ফলে আগন্তুক দিনে গণেশ দে-র সাহিত্য শুধু অসম নয় ভারতবর্ষের প্রতিজন পাঠকের কাছে পৌঁছে যাবে।

পরিশেষে গণেশ দের 'কেন গল্প লিখি' রম্য রচনা থেকে কয়েকটি কথা উল্লেখ করে আমাদের এই আলোচনা সমাপ্ত করব। তিনি লিখেছেন,

"কেন গল্প লিখি? এমন একটা বেয়ারা প্রশ্নের সামনে কোনদিন দাঁড়াতে হবে জানলে হয়তো গল্পই লিখতাম না। এই প্রশ্নটার দুটো অর্থ করে নেওয়া যায়। সোজা অর্থটা হলো আমার গল্প লেখার কারণগুলি কি অর্থাৎ আমার গল্পগুলো সত্যিই ভালো গল্প হয় সুতরাং এই গল্প লেখার প্রেরণা আনন্দ উৎসব ইত্যাদি জানতে ইচ্ছে করে। আরেকটা অর্থ হতে পারে ওহে বাপু গনেশ দে, তুমি যে গল্প নামে উদ্ভট কি সব লেখ ওগুলোর তো কোন উদ্দেশ্য বিধেও খুঁজে মেলেনা তবুও বাপু তুমি কেন গল্প লেখ। ...যারা পেশাদার লেখক তারা তো স্রেফ চাল ডাল তেল নুন অসাধ্য টাকার জন্য লেখেন কিন্তু আমি কেন লিখি? আমাদের বরাক উপত্যকায় তো গল্প লিখে টাকা পাওয়া যায় না গল্প লিখে এখানে হয়না কিছুই তবু তো লিখি। কেন লিখি এই প্রশ্নটা আমাকে যতদিন কেউ করেননি ততদিন এর উত্তর নিয়ে মাথা ঘামায়নি। একবার ভেবেছিলাম প্রশ্নটা নিয়ে কোন পণ্ডিত ব্যক্তির গোচনাস্ত হই গিয়ে বলি ও পন্ডিতমশাই বলে দিন না আমি কেন গল্প লিখি কিন্তু ভেবে দেখেছি তারপর তা যা ঘটতে পারে তার কোনটাই আমার পক্ষে সুখ কর বা আহ্লাদপ্রদ হবার কথা নয়। তাই হাত দেই নিজের ছোট ঝুলিকে শতাব্দি আগে এই শহর শিলচরেই আমার গল্প লেখার হাতে খড়ি। তখন শিলচরের আনকোরা বিশ্লেষণ কোভিদ শহর অতন্দ্র শতাব্দী লুব্ধ কবিসংবাদ প্রকৃতির কবিতা পত্রিকা পত্রিকা মৌচাকে ঝাকে ঝাকে কবি মৌমাছির গুন গুন কবি বন্ধুদের পদ্মচাঁপা গোলাপ গন্ধরাজের মধু আহরণের সাথে আমিও গুলো কবি হয়ে ঘেটু আকন্দ ধুতুরা প্রভৃতি উচা ফুলের মধু আহরণে ব্যস্ত। ফুলকপি কথাটা আমি মন্দ অর্থে ব্যবহার করছি না ভুল থাকে যার সেই তো হল।যাইহোক কবিতা অথবা পদ্মের সেই জগা ঝম্পক কীর্তনের তীরে হঠাৎ মনে হল কবিতা তো হচ্ছে প্রচুর কিন্তু গল্প কই সোমবার নামক কাগজটায় শঙ্কর গুপ্ত আর মহিউদ্দিন এই দুজন মাঝে মাঝে গল্প লিখতেন ঝোঁকের মাথায় প্রকাশ করলাম শনিবার বিকেল নামের একটি গল্প পত্রিকা। এই পত্রিকা স্লোগান দিলাম কাছাড়ে ধানের চেয়ে কবিতার ফলন বেশি এবার কিছু গল্প চাই গল্প লিখুন দু-চারটে গল্প এবং বেশ কিছু না গল্প এল কিন্তু জমলো না তিন ইস্যুতে গল্প পত্রিকার কর্মক আবার কিন্তু আমার গল্প লেখা শুরু হয়ে গেল অসুবিধা রয়ে গেল প্রকাশের স্থানীয় পত্রিকা গুলোর পূজা সংখ্যায় গল্পকারদের ভরসা এরপর অবশ্য আকাশবাণী হয়েছে সাহিত্যের আসর বসেছে তাতে অন্তত গোটা গল্প প্রচারিত হয়েছে আমার। এই তথ্য

থেকে যে তথ্যটা পাওয়া গেল তা হচ্ছে মূলত আমি গল্প লেখা শুরু করি বরাক উপত্যকার ছোট গল্পের ধারাকে পুষ্ঠ করার চেষ্টায়।

চোখের সামনে কোন ঘটনা ঘটতে দেখলে আমার মনে হয় এটা তো অন্যরকম পরিণতি পেতে পারত যা আমাদের কাম্য প্রার্থিত তখনই গল্প লেখার প্রেরণা পাই নানা ঘটনার সমষ্টি এই জীবন যা হতে চায় সেই ব্যাকুলতার পেছন পেছন আমার গল্প লেখার তীর্থ যাত্রা। এছাড়া রয়েছে দৃষ্টিকোণের বিভিন্নতা ইচ্ছে করে আমার দৃষ্টি করে দেখা জীবনটা অন্যকে দেখায় আর সেই তাকে দিয়ে কলমে ভারত গড়তে হয় গল্পের কালি।

বর্তমান মধ্যবিত্ত জীবন যেন এক মোটামুটি সুদৃশ্য কাঠের আসবাব ঘুনে ধরেছে তার সর্বাঙ্গে অদৃশ্য গুণ প্রকার রাত-দিন কাঠ কাটার নির্দয় শব্দ আমাকে আহত করে অশ্লীল করে বাজার ব্যাগ বয়ে চলা নূর পদক্ষেপে চা দোকানের দশ বছরের শিশু শ্রমিকের সমিতির মলিন চোখে সেকেন্ড হ্যান্ড পোশাকে ফিটফাট সেজে থাকা বেকার যুবকটির কৃত্রিম চালচলনে যে জীবন আঁকুপাঁকু করে তাকে সবার সামনে মিলে ধরার তাগিদেই আমি গল্প লিখি।

সর্বোপরি আমি গল্পের জন্য গল্প লিখি না চাবুক আর তুলিকে এক করে আমি গল্প লিখে জীবনের জন্য।"[১১]

তথ্যসূত্র:

১) দে, গণেশ। 'গল্পসমগ্র', যাপনকথা। শোণিতপুর, অসম, প্রথম প্রকাশ– মার্চ ২০১৯, পৃ. ২২।
২) চক্রবর্তী, মিতা। ভারতীয়, সৌমেন ও কর, দীপংকর। 'নির্বাচিত বাংলা ছোটগল্প উত্তর-পূর্ব' (সম্পাদক)। ভি কি পাবলিশার্স, গুয়াহাটি, প্রথম প্রকাশ ২০১৬, পৃ. ২২।
৩) দে, গণেশ 'গল্পসমগ্র', যাপনকথা। শোণিতপুর, অসম, প্রথম প্রকাশ– মার্চ ২০১৯, পৃ. ৩০।
৪) তদেব, পৃ. ৩০।
৫) তদেব, পৃ. ৩০।
৬) তদেব, পৃ. ৩০।
৭) তদেব, পৃ. ৩১।
৮) তদেব, পৃ. ৩১।
৯) তদেব, পৃ. ৩০।
১০) তদেব, পৃ. ৩০।
১১) তদেব, পৃ. ২১।